মূলপাতা

"অপশক্তির সংলাপ"

Niloy Arman

April 4, 2021

8 MIN READ

জোয়ান অব আর্ক ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মধ্যকার হান্ড্রেড ইয়ার্স' ওয়ারের শেষের দিকে এসে ফ্রান্সের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারিনী এক তরুণী। বিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই অস্বাভাবিক যুদ্ধপারদর্শিতা ও নেতৃত্বগুণ দেখিয়ে ফ্রান্সের ন্যাশনাল হিরোইনে পরিণত হন তিনি। তবে এই সম্মান আসে তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পর। খ্রিষ্টান ধর্মে হারাম জাদুবিদ্যার চর্চা করার অভিযোগে ধর্মীয় আদালত তাঁকে পুড়িয়ে হত্যা করার রায় দিলে সেভাবেই তা কার্যকর করা হয়। বিচারে একটি প্রধান ভূমিকা রাখেন বিশপ পিয়েরে কওচন (উচ্চারণ কয়েকরকম আছে)। তিন দশক না যেতেই এই রায়কে বাতিল ঘোষণা করে মৃত জোয়ানকে নির্দোষ ঘোষণা করে ফ্রান্স। জোয়ান এখন শুধু ফ্রান্সের ন্যাশনাল হিরোইনই নন, খ্রিষ্টান ধর্মের স্বীকৃত একজন সেইন্টও বটে। পিয়েরে কওচনই বরং এখন একজন ধীকৃত চরিত্র।

জোয়ানকে নিয়ে অনেক সাহিত্যিকই ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্য লিখেছেন। তাঁদের মাঝে একজন নাট্যাচার্য জর্জ বার্নার্ড শ। জোয়ানকে নিয়ে একজন আইরিশ নাস্তিক নাটক লেখার ঘোষণা দেওয়ার পর ফ্রান্স এবং খ্রিষ্টান বিশ্ব উভয়ই একটু অস্বস্তিতে পড়ে যায়। কিন্তু নাটকটি প্রকাশিত হলে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সব ঠিকঠাকই আছে। শুধু একটা সমস্যা হয়েছে। কওচনকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে দেখানো হয়েছে, যিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য না, বরং চার্চের যথাযথ অধিকারের চর্চা করতে গিয়ে হিসেবে সামান্য গড়বড় করে ফেলেছেন এই আরকি। নাটকের শুরুতে থাকা একটা ভূমিকায় লেখক নিজেই তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন। এ-ও বলে দেন যে, যেকোনো কর্তৃপক্ষের অধিকার আছে তার প্রয়োজনমতো আইন প্রণয়ন করার এবং কেউ তা লঙ্ঘন করলে প্রয়োজনে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার।

সাহিত্য সমালোচকদের কাছে বিষয়টা একটা রহস্য হয়ে দাঁড়ায় যে এইক্ষেত্রে লেখক তাঁর পাঠক-দর্শকদেরকে কার পক্ষে থাকতে বলছেন। একজন কম্যুনিস্ট ঠোঁটকাটা নাস্তিক কেন কওচনকে ভালো মানুষ হিসেবে দেখাবে! পরে একটা হিন্ট পাওয়া গেলো তাঁর এমন আচরণের। শ ছিলেন লেনিনের বলশেভিক সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থক। কুলি-মজদুরদের লাল সেলাম দিতে দিতে ক্ষমতায় আসা লেনিন তখন রীতিমতো একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন। ক্যাথলিক চার্চ যেমন হেরেটিকদেরকে ইনকুইজিশানের মধ্য দিয়ে বিচার করতো (যেভাবে জোয়ানের বিচার হয়েছে), লেনিনও তাঁর দেশে বিরোধী মতের লোকদের ঠিক একই রকম বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিতেন, প্রয়োজনে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। কওচনের প্রতি শ-এর সিম্প্যাথি আসলে লেনিনের কাজকর্মের প্রতি তাঁর সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ।

দুই

রচয়িতা (author), কথক (narrator) আর চরিত্রের (character) মাঝে পার্থক্য বুঝতে না পারলে অনেক ভুলভাল ম্যাসেজ পাওয়া যায়। ইশপের গল্পের মতো সহজসরল কাহিনীতে আমরা সহজেই লেখক (রচয়িতা) এর বক্তব্য বুঝতে পারি। আরেকটু জটিল ফিকশানে নায়কের বক্তব্যই রচয়িতার বক্তব্য। তা না হলেও আমরা অন্তত এটুকু বুঝতে পারি একটা ফিকশানে good guys কারা আর bad guys কারা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপে বিভিন্ন মডার্নিস্ট ধ্যানধারণা চালু হওয়ার পর সাহিত্য জগতেও এসবের প্রভাব পড়ে। জগতের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যহীনতা সংক্রান্ত দর্শন আর বিশ্বযুদ্ধগুলোর চাপে পিষ্ট হয়ে ভালো-খারাপের ধারণাগুলোকে নতুন করে ভাবতে শুরু করা হয়। পৌরাণিক কাহিনী আর সাহিত্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রোটাগনিস্ট –অ্যান্টাগনিস্ট (সহজ ভাষায় নায়ক-ভিলেইন) এর পার্থক্যটা ঝাপসা হতে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যে। এমন এমন ফিকশান রচিত হয় যেখানে নিশ্চিত করে বলা যায় না কে

নায়ক, আর কে ভিলেইন (উত্তরাধুনিক যুগে তো কে নায়ক, আর কে নায়িকা সে পার্থক্য করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে), আর কোনটা আসলে লেখকের নিজের বক্তব্য। বাইবেলের কাহিনীকে একটু সাহিত্যরস দিয়ে শয়তানকে ট্র্যাজিক হিরো বানানোর কাজ এরও অনেক আগে জন মিল্টন করে গেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে এরকম একটা উদাহরণ ব্যাটম্যান-জোকারের জুটি। জোকারকে বলা হয় এমন একজন ভিলেইন যে তার হিরোর চেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কারণ তার মুখ আর হাত দিয়ে পরিচালক অনেক গভীর দার্শনিক কথাবার্তা ও কাজকর্ম তুলে এনেছেন যা ব্যাটম্যান দিয়ে তুলে আনা যায়নি।

কোনো সাহিত্যিক যদি প্রথাবিরোধী কোনো ধারণার প্রবর্তন করতে চান কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্র বেশি অত্যাচারী হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের টেকনিক অবলম্বন করে তাঁরা নিজেদের মতামতগুলো সমাজে পুশ করেন। যদি জেরা করা হয়, তাহলে এমার্জেন্সি এক্সিট তো আছেই "আরে এটা তো আমার বক্তব্য না, অমুক চরিত্রের বক্তব্য।" ইসলামের ব্যাপারে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রয়াত হুমায়ূন আহমেদ (আজাদ না) এই কাজ খুব দক্ষতার সাথে করেছেন। এর বাইরেও আরো অনেকে থাকতে পারেন আমার অজানা।

ফিকশানের হাত ধরে আসা এই স্ট্র্যাটেজি অনেক নন-ফিকশানেও (প্রবন্ধ, নিউজ ইত্যাদি) অনুসরণ করা হয়। মহা-অত্যাচারী একটা ক্যাপিটালিস্ট সমাজে কেউ হয়তো সোশ্যালিস্ট আন্দোলন শুরু করতে চান, পেশায় হয়তো তিনি সাংবাদিক। এমনি এমনি রিপোর্ট করার ছলে কোনো একটা বিপ্লবী আইডিয়াকে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলতে পারেন। নিজের পক্ষ-বিপক্ষ কিছুই হয়তো বললেন না। কিন্তু সচেতন শ্রোতা বা পাঠকের চিন্তার জগতে একটা ধাক্কা লেগে গেলো- "আরে! এভাবেও ভাবা যায়!"

তিন

কিশোর আলো পত্রিকায় ছাপা হওয়া একটা কার্টুন নিয়ে কিছুদিন আগে বেশ তোলপাড় হয়ে গেলো। গরুর রূপ ধরে এক মহাজাগতিক ভিলেইন বলছে "যারা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী গরুকে খায়, তারা এমন অমন।" পুরো কার্টুনটা পড়লে দেখা যায় (এবং কর্তৃপক্ষ নিজেরাও বিবৃতি দিয়েছে যে), সেটা আসলে অপশক্তির (antagonist) সংলাপ। কুরবানির ঈদ আসার ঠিক আগে দিয়ে এই কার্টুনের প্রকাশও কাকতাল মাত্র। তাই এটা নিয়ে রাজনীতি করার কিছু নেই।

কিন্তু এরকম পদ্ধতিতে ইসলামবিদ্বেষ ছড়ানোটা কিশোর আলো'র প্যারেন্ট পত্রিকা এবং এ ধরনের মিডিয়া ওভারঅল যে আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের পক্ষ থেকে আগেও পাওয়া গেছে। একটা ছোট্ট ম্যাসেজকে আপনি হেসে উড়িয়ে দিলেন তো আপনার চিন্তার জগতের একটা গেইটের পাস তাদেরকে দিয়ে দিলেন। সেটা খুলে ভেতরে ঢুকে তারা পরের গেইটে এঞ্জিনিয়ারিং শুরু করবে। তাই একটা পত্রিকার একটা ক্রোড়পত্রের একটা সংখ্যার একটা কার্টুনের একটা বক্স নিয়ে মুসলিমদের এত তোলপাড় আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয়নি।

চার

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান বন্যায় প্লাবিত। কোনো জায়গা থেকে দাবি এসেছে এবার গরু কাটাকাটির পেছনে এত শক্তি-অর্থ "অপচয়" না করে বন্যার্তদেরকে কিছু সাহায্য করতে। উত্তেজিত না হয়ে এই দাবিগুলোকে আমরা একটু নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখার চেষ্টা করি।

এই দাবিগুলো যারা তোলে তারা প্রথম যে ভুলটা করে তা হলো ইসলামী শরিয়তের সোর্সগুলোকে সাহিত্যকর্মের লেভেলে নামিয়ে এনে চিন্তা করা। সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হলো এর উপর লেখকের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিটা পাঠক (বা দর্শক-শ্রোতা) সাহিত্যিকের কাজটাকে নিজ নিজ জ্ঞান-বিচারবুদ্ধি-অভিজ্ঞতা থেকে নিজের মতো করে একটা ইন্টারপ্রেটেশান বের করে।

সত্যি বলতে পৌত্তলিক ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো নিজেদেরকে এই স্বাধীনতার প্রতি সঁপেও দিয়েছে। সেখানে ইসলামের সোর্সগুলোর টেক্সট সংরক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি এর বাস্তব প্রয়োগপদ্ধতির সংরক্ষণও এমন সুঠাম অ্যাকাডেমিক পন্থায় হয়েছে যে তা এক ঐতিহাসিক সত্য। যে কেউ নিজের পছন্দমতো একটা ব্যাখ্যা নিয়ে আসলে এই সংরক্ষিত বডির বিপরীতে নতুন ব্যাখ্যাটার অ্যাবসার্ডিটি এত নগ্ন হয়ে ধরা পড়ে যে, তা আলাদা করে কাউকে বলে দিতে হয় না। "নামাজ পড়ার উদ্দেশ্য মনকে স্থির করা। কোয়ান্টাম মেথডে ধ্যান করলেই যেহেতু মন স্থির হয়ে যায়, তাই নামাজ না পড়লেও চলবে" – এরকম ব্যাখ্যা দিয়ে কাউকে আপনি পার পেতে দেখবেন না। একই কথা খাটে পশু জবাই না করে বন্যার্তদের টাকা দিয়ে ত্যাগের দায়ভার মেটানোর ন্যারেটিভের ক্ষেত্রেও।

নিরপেক্ষতা আপেক্ষিক। ফুটবল গ্যালারির নিরপেক্ষ দর্শকটা হয়তো ক্রিকেট গ্যালারিতে কোনো দলের রক্তারক্তি সমর্থক। যেকোনো ব্যক্তি, যেকোনো সংগঠন, যতই অরাজনৈতিক দাবিদার হোক, যতই ত্রাণ বিলানোর মতো নিরীহদর্শন কাজকর্ম করুক, সে বা তারা কোনো না কোনো একটা আদর্শের অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব করে, জেনে বা না জেনে।

এই গরীব-দুঃখীদেরকে সাহায্য করার আপাত নিরীহ দাবিটা সবসময় একটা না একটা কনটেক্সটে, কোনো নির্দিষ্ট ব্লকের লোকদের পক্ষ থেকে আসে। এটা যেকোনো দেশ, যেকোনো যুগ, যেকোনো পাত্র-পাত্রীর ক্ষেত্রে সত্য। বিরোধী ব্লককে দু'চোখে দেখতে না পারলে, কিন্তু তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার মতো যথেষ্ট শক্তিও না থাকলে এই গরীব-দুঃখী কার্ডটা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই কার্ডের সমস্যাটা হচ্ছে এটা সবার পকেটেই আছে। দূর্গাপূজায় বানানো প্রতিমা, দলের নেতার মৃত্যুবার্ষিকী আয়োজন বাবদ খরচ, সফররত টীমের নিরাপত্তাজনিত ব্যয়, ঘরে একটা টিভি থাকার পরও মা-বাবার সুবিধার জন্য কিনে দেওয়া দ্বিতীয়টা, থিসিস পেপার জমা হওয়ার আনন্দে খাওয়া ওই চিকেন গ্রীল, প্রতিবাদে ওড়ানো বেলুন আর পোড়ানো মোম, এই লেখাটা লেখা ও পড়ার জন্য ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ডিভাইস – প্রতিটা টেবিলেই এই গরীব-দুঃখী কার্ডটা ফেলা যায়। এবং ফেলা হয়ও। কারা ফেলে? যে যেটার বিরোধী, সে সেখানে ফেলে।

নিজের পছন্দের এইসকল কাজ বাদ দিয়ে কেউ ত্রাণ বিলি করে না। প্রয়োজনে ত্রাণ দেয়, পাশাপাশি এসব কাজও চালু রাখে। এমনও না যে ইসলামী আদর্শের ধারক হওয়ার দাবিদার কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন এই বন্যায় কোনো ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম করছে না। কুরবানিকে কুরবানির জায়গায় রেখেই তারা এ কাজ করছে। সত্যি বলতে সামর্থ্যবান মুসলিমরা এ বছর কুরবানি না দিলে বন্যার্ত লোকেরা তাদের গবাদি পশু নিয়ে বিপদেই পড়ে যাবে। তাই বাস্তবতার দাবি ছিলো মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সামর্থ্যবান মানুষ গিয়ে বন্যার্তদের এই পশুগুলো কিনে নিয়ে আসবে!

পাঁচ

যেসব কাজ বাদ দিতে বলা হচ্ছে, তার প্রত্যেকটাই কারো না কারো কাছে গুরুত্বপূর্ণ। মূর্তিপূজা, ভাস্কর্যপূজা, সেলেব্রিটিপূজা – এ সবই কারো না কারো ধর্মের অংশ। কোনো কিছুতেই খরচ হওয়া টাকা বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে উড়ে যায় না। যে প্রতিমা বানাতে জানে, তার কর্মসংস্থান হচ্ছে, বেলুন ব্যবসায়ীর লাভ হচ্ছে, ডিশলাইন ব্যবসায়ীর মুনাফা হচ্ছে। অর্থনীতির চাকা ঘুরছে। মোমবাতিওয়ালা চায় না আপনি শোকে মোমবাতি না জ্বালিয়ে সেই টাকা বন্যার পানিতে ফেলে দিবেন।

তাহলে সমাধান কী?

ইন্সট্যান্ট সমাধান নেই। শুধু চিন্তার খোরাক জোগানোর জন্য কিছু কথা বলা যেতে পারে। ইসলামে কিছু কাজ শির্ক, কিছু কুফর, কিছু বিদ'আত, কিছু হারাম। কিছু কাজ আবার অপছন্দনীয়, কিছু হালাল হলেও অপ্রয়োজনীয়, কিছু জিনিস আবার হালাল এবং প্রয়োজনীয় হওয়ার পরও না থাকলেও জীবন কেটে যায়।

যা কিছু দেখি বা না দেখি, তার স্রষ্টা যেই জায়গায় খরচ করতে নিষেধ বা নিরুৎসাহিত করেছেন, সে জায়গায় খরচ করলে বারাকাহ আসবে না। আল্লাহ আমাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন, সেখান থেকে তারঁই নির্দেশিত পথে পথগুলোতে আমরা খরচ

করে দেখতে পারি একটা উত্তম সমাধান আসে কি না। আর যেসব জায়গায় তিনি খরচ না করতে বা কম করতে বলেছেন, সেসব জায়গায়ও সে অনুযায়ী কাজ করে দেখতে পারি কোনো লাভ হয় কি না। ধনী আরো ধনী হওয়ার, গরীব আরো গরীব হওয়ার, বিশ্বের অর্ধেক সম্পদ আটজন ব্যক্তির মালিকানায় থাকার মতো অসহ্য এই বাস্তবতার কোনো পরিবর্তন হয় কি না।

* * *

August 23, 2017